আজব দেশের বন্দি মেয়ে

বারোয়ারি উপন্যাস

লিখেছেন :

শৈলেন ঘোষ, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়,
প্রবাস দত্ত, অশোককুমার মিত্র, শেখর বসু,
তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্তিক ঘোষ,
অমর মিত্র, কিন্নর রায়, সুধীন্দ্র সরকার, হীরেন চট্টোপাধ্যায়

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

বারোয়ারি-উপন্যাস লেখানো এক ধরনের মজার অভিজ্ঞতা, লেখাও।

এ যেন এক রিলে-দৌড়, আগেরজনের লাঠি নিয়ে পরের জনের দৌড় শুরু। এই দৌড়বাজ আপন বৈশিষ্ট্যে দৌড়বেন— দৌড়কে সফল সমাপ্তির দিকে নিয়ে যেতে পরবর্তী দৌড়বাজের হাতে তুলে দেবেন স্টিক। তবে তফাৎ দুটো— প্রথমত দৌড়বাজকে অনুসরণ করতে হয় নির্দ্দিষ্ট ট্র্যাক নইলে বাতিল, আর উপন্যাসের কিস্তি লেখকের রাজ্যে নেই কোনো বাঁধা পথ, বরং তার জন্য রয়েছে কল্পলোকের অবাধ জমিন। আর দৌড়বাজের আছে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী আর লেখকের প্রতিদ্বন্দ্বী তিনি নিজেই। তাঁর লেখাকে আরো উন্নত করার তাগিদ। সম্পাদক হিসাবে আমার কাজ ছিল এক লেখকের কাছ থেকে নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর কিস্তির লেখাটি উদ্ধার করে পরবর্তী লেখকের দরবারে পেশ করা। আসলে, এ লেখায় কোনো পূর্ব-পরিকল্পনা ছিল না— অনেকটা যেন হালভাঙা নাও চালনা— তাই নিরুদ্দেশের তরণীকে ঠিক সময়ে কূলে ভেড়ানো যাবে কিনা তাই লক্ষ করতাম মাত্র।

গোড়ার কথাটা একটুখানি বলে নিই— ঝালাপালা বার্ষিকী (১৪০৯)-এর একটি বারোয়ারি উপন্যাস প্রকাশের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, এ কাজে বেছে নেওয়া হয়েছিল বারোজন লেখকের একটি দল। বহুবছর আগে (১৩৪০) মাসিকপত্র মাস-পয়লা-য় প্রথমবার এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল যেখানে বারোমাসে বারোজন লেখক বারো কিস্তি লিখে অজানার উজানে উপন্যাসখানি শেষ করেন। সেখানে নির্ধারিত লেখকেরা অনেক আগেই গল্পটির সঙ্গে পরিচিত হয়ে সে সম্পর্কে আগাম ভাবনা ভাবতে পারতেন— এখানে কিন্তু সে সুযোগ আদৌ ছিল না। নির্ধারিত দিনে কিস্তি-লেখকের হাতে আগের কিস্তিগুলো তুলে দিয়ে হয়তো এক সপ্তাহে তাঁকে লিখে দিতে বলেছি— তিনি হাসি মুখে সে কাজটি করে দিয়েছেন— এবং আপন বৈশিষ্ট্যে লেখাটিকে নিজের মতো করে এগিয়ে দিয়েছেন। কোনো রসহানি না করেই গল্পের সূচিমুখ হয়তো বদলে গিয়েছে। যেমন কাহিনি শুরু হয়েছিল রূপকথার জগতে, তারপরে দিক বদল করতে করতে তা এসে পড়েছিল চরম বাস্তব উগ্রপন্থীদের মাঝে, শেষে মিলিয়েছে ফ্যান্টাসির পৃথিবীতে, পাঠকের জন্যে খুলে দেওয়া হয়েছে কল্পনার বিস্তৃত আকাশ। কিস্তিগুলোর প্রথম পাঠক হিসেবে আমার মনে হয়েছিল লেখকেরা নিজেদের মুনশিয়ানার প্রতি কোনো অবিচার করেন নি।

নানা কাজের মধ্যেও ব্যস্ত লেখকেরা ঝালাপালার কিশোর পাঠক বন্ধুদের কথা ভেবে যথা সময়ে তাঁদের কিস্তি লিখে দিয়েছিলেন বলে এই গ্রন্থ-প্রকাশের সুযোগে তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কৃতজ্ঞতা 'পুনশ্চ'-কেও সেই বারোয়ারি উপন্যাসকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য।

যারা ঝালাপালা পড়েছিল আর যারা ঝালাপালা পড়েনি তাদের সকলের জন্যে এই গ্রন্থ প্রকাশ; তাদের ভালো লাগলেই আমাদের শ্রম সার্থক।

কলকাতা
বইমেলা, ২০০৬

অশোককুমার মিত্র

॥ এক ॥

দ্যাখো, জায়গাটা কেমন ছেয়ে গেছে সবুজে। বাতাস কেমন লুটোপুটি খাচ্ছে ঘাসে-ঘাসে! শুনতে পাচ্ছ হাততালি সবুজপাতার গাছে-গাছে? উছলে পড়েছে রোদ। নদীর জলে আলোর টোসা ঝলমল করছে। রোদ-ভরন্ত আকাশটার কেমন ছায়া পড়েছে জলের ওপর।

আকাশের কী মজা। সে সব দেখছে, সব সময়।

দেখছে, তোমাকে।

দেখছে, আমাকে।

দেখছে, পৃথিবীজোড়া নানান দেশ। নানান মানুষ। তোমার মতো। আমার মতো।

পাহাড়, সমুদ্দুর, মরুভূমি কী না-দেখছে আকাশ!

দেখছে, কত দিন, কত বছর, কত কাল ধরে।

আচ্ছা, আকাশ কি কোনওদিন বুড়ো হবে না?

কে জানে! কে বলবে সে কথা!

হ্যাঁ, ওই দূরে দেখতে পাচ্ছ একটা বাড়ি? দেখতে পাচ্ছ খোলা জানলা? দ্যাখো, জানলার ধারে দাঁড়িয়ে একটি ছেলে। একলাটি। তার মাথা হেলে আছে জানলার গরাদে। এসো তো, চুপিচুপি যাই ওর কাছে, ওই জানলার ধারে।

ওহো! এই ছেলেটির নামই তো তুর্কি। কেমন আকাশের দিকে সে চেয়ে আছে আনমনে।

কেন? সে কি বন্দি? এই ঘরে?

তাই-কি সে ভাবছে এসব কথা? আকাশ দেখে? তারও কি ইচ্ছে করে ওই আকাশের মতো সারা পৃথিবীটাকে দেখতে?

তার কি কোনও বন্ধু নেই খেলার? আনন্দ করার?

না।

কোনও গান বাজে না এ ঘরে। কোনও হাসি শোনা যায় না এখানে। তার পা দুখানি এখানে খেলতে-খেলতে নাচে না।

এখানে শোনা যায় তার বুক ভর্তি নিশ্বাসের শব্দ। সেই নিশ্বাস যখন দীর্ঘশ্বাস হয়ে সারা ঘর ভরে যায়, তখন সে আর দাঁড়ায় না জানলার ধারে। শুয়ে পড়ে ওই মাদুর বিছানো বিছানায়।

কেউ হাঁক পাড়লে সে ধড়ফড় করে উঠে পড়ে। 'যাই বাবু' বলে ঘরের দরজা খুলে ছুটে যায়।

নয়তো, ‘‘যাই মা’’।

কিংবা, ‘‘যাই দিদি’’।

আর নয়তো, ‘‘যাচ্ছি’’।

ফরমাশ্ খাটতে হয় তাকে। কত রকমের ফরমাশ ঃ

এটা আন্। সেটা কই?

জল দে। হাটে ছোট্।

লেগে গেল হই-চই।

হ্যাঁ, সে কাজ করে এই বাড়িতে। এটা তার বাবুর বাড়ি। বাবুর বাড়ির কাজের ছেলে সে। যেমন, যে-মাসি কাজ করে তপুদের বাড়িতে, তার নাম কাজের মাসি।

যেমন, যে-দিদি কাজ করে মিলিদের বাড়িতে, তার নাম কাজের দিদি।

তেমনই, যে-বাড়িতে তুর্কি কাজ করে, সে-বাড়িতে সে কাজের ছেলে। তা হবে, তার বয়েস এগারো, কী বারো। এখন তুমিই বলতে পারো, সে তোমার চেয়ে ছোটো, না বড়ো।

তোমার তো বই আছে হরেক রকম।

তার নেই।

তুমি তো ইস্কুলে যাও বই নিয়ে।

সে যায় না।

তুমি তো ছবি আঁকো রং-তুলিতে।

সে আঁকে না।

তুমি তো খেলা কর ইচ্ছে মতো।

সে করে না।

কিন্তু সে গল্প শোনে।

গল্প!

হ্যাঁ, শোনে সে চুপিচুপি। এ-বাড়ির দিদি যখন রাত্তির বেলা পাশের ঘরে গল্প বলে ভাইকে, তুর্কি তখন তার বন্ধ ঘরের দরজায় কান পেতে সেই গল্প চুপিচুপি শোনে। কেউ জানতেও পারে না। না জানাই ভালো, জানলেই তো বকা!

দিদি কত গল্প জানে।

শুনতে-শুনতে অবাক হয়ে যায় তুর্কি।

মস্ত-মস্ত বই আছে দিদির। দিদি রোজ ইস্কুলে যায়।

পড়তে নয়, পড়াতে।

তাই তার জানারও শেষ নেই।

অনেক না-জানলে ইস্কুলে পড়ানো যায় নাকি!

কত দেশের কত কথা জানে দিদি। সে সব দেশের কেমন সব নাম। একদিন সে শুনেছিল এক সোনার দেশের গল্প ঃ

অনেক, অ-নে-ক দিন আগের কথা, সেই সোনার দেশে ছিল এক মস্ত রাজা। তার ভাণ্ডারে অঢেল সোনা। এত সোনা যে, সেই মস্ত রাজা সোনার চুর গায়ে মেখে চান করত হ্রদে গা ডুবিয়ে। তা, একথা কী-আর গোপন থাকে! এ-কান থেকে সে-কান, সে-কান থেকে আর এক-কান করতে করতে সারা পৃথিবীতে রাষ্ট্র হয়ে গেল সোনার খবর। এমনকী যে-দেশে ফর্সা মানুষ বাস করে, সেই ফর্সা মানুষের দেশেও পৌঁছে গেল এই খবর। লোভে তাদের ঘুম হয় না রাতে, কাজ বন্ধ দিনে। সমুদ্দুরে জাহাজ ভাসিয়ে ছুটল তারা সোনা খুঁজতে।

এ দেশ, সে দেশ,

এ বন্দর, সে বন্দর,

কত হ্রদ, কত নদী।

সব তন্ন-তন্ন করে ঢুঁড়ে ফেলল তারা। হায়, হায়, কই সোনা! মুখ চুন করে ফিরে এল।

একদল ফেরে তো আর একদল ছোটে।

তাদের পেছনে আর একদল।

তার পরে দলে দল।

সোনার লোভে সবাই পাগল।

কেউ ছাড়ে না কাউকে।

সোনার লোভে নিজেদের মধ্যে শুরু হয় কথা কাটাকাটি।

তার পরে হাতাহাতি।

রক্তারক্তি!

কেউ যদি বলে, সোনা এখানে নেই, অন্য কোথাও। লোকে অমনই ছোটে, চোখকান বুজে সেই অন্য কোথাও।

যায়, গভীর বনে।

না-হয় পাহাড় চুড়োয়।

নয়তো ডুব দেয় নদীর অতল জলে।

সে এক তুলকালাম কাণ্ড।

সোনার হদিস? নেই, নেই। হদিস নেই আজও।

তুর্কি ভাবে, ওই আকাশ তো জানে, আকাশ তো দেখেছে সোনা আছে, কি নেই। কিন্তু আকাশ তো শুধু দেখে চোখ মেলে। মুখ ফুটে কথা তো বলতে পারে না, যে জিজ্ঞেস করলে বলবে? যদি কথা বলতে পারত, তবে নিশ্চয়ই বলত, যে-দেশ নিয়ে এত হুলুস্থুল কাণ্ড, সে-দেশটার নাম এলডোরাডো।

তুর্কি তো-আর একটা গল্প শোনেনি সোনার। শুনেছে আরও গল্প। শুনেছে, সেবা নামে এক রানির গল্প। সেই রানিরও ছিল অফুরন্ত সোনার ভাণ্ডার। ছিল মণি-মাণিক্যের ছড়াছড়ি।

একটি সুন্দর রাজ্য ছিল রানির।

পাহাড়ঘেরা।

তাঁর রাজ্যের নাম ইয়েমেন।

ইয়েমেনের জমিতে ফসল ফলত প্রচুর। সম্পদে ভরপুর। উপচে পড়ত।

রানি সেবা একদিন শুনলেন, সলোমন নামে এক রাজার কথা। তিনি রাজত্ব করতেন জেরুজালেমে। তিনি অশেষ জ্ঞানী। কেউ তাঁকে কথায় কাবু করতে পারে না। পৃথিবীর হেন কিছু নেই, যা তাঁর না-জানা। তুমি জিজ্ঞেস করো যে-কোনও কঠিন প্রশ্ন, মুখে-মুখে উত্তর। ঘাঁটবার দরকার নেই কোনও বই। কী, ভাববার দরকার নেই আকাশের দিকে চেয়ে।

তাঁর এই জ্ঞানের খবরে অবাক হলেন রানি। ভাবলেন, তা হলে তো রাজা সলোমনকে পরীক্ষা করে দেখতে হয়। তিনি চললেন জেরুজালেম।

জেরুজালেম ছিল রাজা সলোমনের রাজধানী।

রানির সঙ্গে চলল সার সার উট। উটের পিঠে সোনার বোঝা।

সোনার সঙ্গে রাশি-রাশি হিরে জহরত।

মশলাপাতি।

আরও কত কী।

এ ছিল রাজা সলোমনের জন্যে, রানি সেবার উপহারের বহর।

রানির রাজ্য ছিল আরব দেশের দক্ষিণ দিকে।

রাজা সলোমন রাজত্ব করতেন একেবারে ঠিক তার উলটো দিকে, সটান উত্তরে।

তা, উত্তর দিকে রানিকে যেতে হবে কত জনপদ পার হয়ে। যেতে-যেতে ছুঁতে হবে তপ্ত মরুর বুক। লেগে গেল কত দিন, কত রাত, কত সময়।

রানির সেই অভিযান ওই আকাশ স্পষ্ট দেখেছে।

দিদির মুখে গল্প শুনে সেই আকাশকে অবাক হয়ে দেখার যেন শেষ নেই তুর্কিরও। এখনও দেখছে সে, একলা। এখনও তার মুখখানি জানলার গরাদে ঠেকে আছে।

নিথর নিস্তব্ধ চারদিক। দিদির মুখের গল্প যেন রং ঝলমল ছবির মতো তার চোখের ওপর ভেসে উঠছে এখন। একটি-একটি। বারে-বারে।

হঠাৎ যেন আকাশের নীলে ছেয়ে যায় চারদিক।

হঠাৎ যেন সেই নীল ঢেকে ফেলে তুর্কির সারা দেহ।

সে যেন পৌঁছে যায় পাঁচ হাজার বছর আগের এক দেশে।

সেই গল্পের দেশের নাম সে মনে করতে পারে না।

সে-দেশের চারদিকে সমুদ্দুর। সোনালি জল।

একটি ছোট্ট দ্বীপ জলের কিনারে। সুন্দর!

পাহাড় এদিকে ওদিকে।

সবুজ বনানী পাহাড়ের গায়ে-গায়ে।

সেখানে কত হরিণ, কত পাখি, কত কাঠবিড়ালি।

অবাক হয়ে দেখছে তুর্কি। ভাবছে কেমন করে এল সে এখানে!

বনের হরিণ তাকে দেখে থমকে যায়।

গাছের পাখিরা কলতান তুলে উড়ে পালায় এ ডালে, ও ডালে।

পাহাড়ের পাথরের ফোকর থেকে উঁকি মারে খরগোশ।

কাঠবিড়ালি ছুট দেয়।

এ কোথায় এসেছে তুর্কি?

তবে কি আকাশ তাকে নিয়ে এসেছে এখানে?

তুর্কি হরিণকে ডাকে, "আয়, আয়!"

হরিণ চেয়েই থাকে।

এত্তোটুকু ল্যাজ হরিণের কাঁপে, ফিরিক-ফিরিক।

মস্ত মস্ত শিং তার নাড়ে, যেন ডালপালা, গাছের।

তুর্কি ধরতে যায়।

ছুটে পালায়।

একটা হরিণ ছোটে তো, আর একটা আসে।

এমনই করে একটা, দুটো, তিনটে।

তারপর অসংখ্য।

সুন্দর!

অসংখ্য সুন্দরে বন যেন উছলে উঠেছে।

না, মনে নেই তুর্কির। তার, ছোট্ট ঘরখানার কথা।

খেয়াল নেই তার, সে এখন দাঁড়িয়ে আছে তার সেই ছোট্ট ঘরের জানলায় মাথা ঠেকিয়ে।

এখন আর শুনতে পায় না তুর্কি কারও হাঁক।

শুনতে পায় না বাবুর ডাক। মায়ের হুকুম।

এখন যেন সে হরিণের বন্ধু এই বনে। সে-ও ছুটল হরিণের সঙ্গে। সে-ও চিৎকার করে উঠল। সে-ও হেসে উঠল, হা-হা-হা!

এ বনটা এখন তুর্কির।

তুর্কি ছুটতে-ছুটতে দূরে যায়, হরিণের সঙ্গে। অনেক দূরে। আরও দূরে। পাহাড়ের আরও গভীরে।

কোথাও মস্ত উঁচু দেবদারু সারে-সারে।

কোথাও পাইন। কোথাও ওক।

কোথাও বা মিষ্টি বাদামের গাছ। ছড়াছড়ি।

কী নির্জন!

হঠাৎ যেন ভেঙে যায় নির্জনতা।